সিটি করপোরেশন নির্বাচন ও নাগরিক ভাবনা

ড. তোফায়েল আহমেদ[১]

সিটি করপোরেশন বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকারব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর। সাধারণত নগরের স্থানীয় সরকারকে 'পৌরসভা' বলা হলেও সিটি করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এলাকাকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিত থেকে 'মহানগর' বলা হয়। বাংলাদেশে প্রশাসনিকভাবে অনুরূপ মহানগরের সংখ্যা ১২টি। যেসব মহানগরীতে সিটি করপোরেশন রয়েছে তা হচ্ছে যথাক্রমে ঢাকা উত্তর সিটি, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ। তাছাড়া দেশের অন্যান্য শহরে রয়েছে ৩২৭টি পৌরসভা। সে পৌরসভাগুলো আবার 'ক', 'খ' ও 'গ' শ্রেণিতে বিভক্ত। মূলত তাদের রাজস্ব সংগ্রহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে এ শ্রেণি বিন্যাস করা হয়।

নগর-মহানগরের সংজ্ঞায়নঃ

দেশে প্রশাসনিক নির্দেশে কোনো ইউনিয়ন ও উপজেলা এলাকায় পৌরসভা গঠন বা ঘোষণার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো মাপকাঠি অনুসরণ করা হয় না। এটি এক ধরনের রাজনৈতিক অভিপ্রায়; সরকারি নির্দেশে গঠিত হয়ে যায়। যদিও পৌরসভা গঠনের জন্য এলাকার জনসংখ্যা, পেশা, উন্নয়ন তথা শিল্পায়নের প্রকৃতি ইত্যাদি বিবেচনায় রাখার কথা। অকৃষি পেশার প্রাধান্য না থাকা সত্ত্বেও কোনো কোনো কৃষি-প্রধান এলাকা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং সিটি করপোরেশন এলাকার মধ্যে কৃষি-প্রধান এলাকাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।

আমাদের পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের আইন, গঠন ও ব্যবস্থাপনা এবং তথাকথিত গ্রামীণ স্থানীয় সরকার সংস্থা তথা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও জেলা পরিষদের কর্মপ্রকৃতি, অর্থায়ন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক অসামঞ্জস্যতা ও জটিলতা রয়েছে। বর্তমান আলোচনায় আমাদের সেদিকে যাওয়ার অবকাশ সীমিত। আসন্ন মহানগরীর স্থানীয় সরকার সংগঠন সিটি করপোরেশন নির্বাচন নিয়ে মূলত আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার কথা।

১২টি সিটি করপোরেশনের মধ্যে ঢাকা উত্তরের মেয়র ও ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ দুই করপোরেশনের ১৮টি করে ৩৬টি ওয়ার্ডের নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েও তা আদালতের সিদ্ধান্তে স্থগিত আছে। সিলেট, গাজীপুর, খুলনা, রাজশাহী ও বরিশাল–এ পাঁচটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মেয়াদ চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে উত্তীর্ণ হতে যাচ্ছে। আগামী ১৫ মে এ পাঁচটির মধ্যে দুটি যথা গাজীপুর ও খুলনায় ইতিমধ্যে ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন অর্থাৎ সিটি নির্বাচনকে ঘিরে জনমনে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। থাকা স্বাভাবিক। তবে সকল প্রশ্নের বিষয় মূলত একটি বিন্দুতে এসে শেষ হয়। তা হচ্ছে সরকারি প্রভাবমুক্ত একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন, যেখানে প্রার্থীরা নির্ভয়ে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে প্রচার-প্রচারণা চালাবে এবং নির্বাচনের দিন স্বাধীনভাবে কোনো রকমের ভয়-ভীতি ছাড়া মানুষ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবে। এটি কোনো বাড়তি বা অতিরিক্ত চাওয়া নয়। দেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইনানুযায়ী এটিই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু নানা কারণে এ স্বাভাবিক চাওয়া এদেশে সাধারণ এ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিকভাবে পূরণ হয় না। এক্ষেত্রে যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের দৃঢ়তা এবং সরকারের সুষ্ঠু নির্বাচন ও গণতন্ত্রের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাছাড়া রয়েছে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর আইনানুগ সদাচারণ।

নির্বাচনী সমস্যাসমূহের প্রকৃতি ও বিস্তারঃ

নির্বাচন দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি প্রধানতম ঘটনা। দীর্ঘদিনের রাজনীতি চর্চার পর রাজনৈতিক দলের শাসনক্ষমতা লাভের প্রধানতম স্বীকৃত ও বৈধ উপায় হলো একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে দেশের অধিকাংশ মানুষের আনুষ্ঠানিক সমর্থন লাভ। কিন্তু সরাসরি বৈধ পথে আনুষ্ঠানিক সমর্থন লাভের উপায় নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বাধিক সংখ্যক ভোট পাওয়া। এ ভোট পাওয়া ও ভোট দেয়ার বৈধ উপায় ভোটদানের এ পথটি নানা সংকটে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। বিশেষত ক্ষমতাসীন দল বা গোষ্ঠী যখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাহী ক্ষমতার সুবিধা ব্যবহার করে নানা কূট-কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। আমাদের দেশে নির্বাচনে 'ক্ষমতা ভীতি' একটি 'হিস্টিরিয়া' বা 'ফোবিয়া' যাই বলা হোক সেভাবে সর্বগ্রাসীরূপে দেখা দিয়েছে। জাতীয় কিংবা স্থানীয় নির্বাচন আসলেই জনমনে প্রথম যে ভীতি বা আশঙ্কা দেখা দেয় তা হচ্ছে সরকার বা সরকারি দলের অনুকূলে নির্বাচনী ফলাফলকে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হতে পারে। এক্ষেত্রে নির্বাচনী আইন বা দেশের প্রচলিত অন্যান্য আইনের প্রয়োগ সবার জন্য সমানভাবে হবে না। বিরোধী পক্ষগুলো সমস্বরে অভিযোগ করতে থাকে। এতসবের মধ্যেও মাঝে মাঝে সুষ্ঠু নির্বাচন কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের কথা বাদ দিলে ও তার আগে ও পরে নির্বাচনী ব্যবস্থার একটি বিপর্যয়কর অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ নাগরিক সমাজ হতাশ। কারণ এখন যে পাঁচটি সিটি করপোরেশনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তাতে ২০১৩ সালে মেয়র পদে ক্ষমতাসীন সরকারি দল পরাজিত হয়। তৎপরবর্তীতে অর্থাৎ ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও জেলা পরিষদ নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক কারচুপি, অনিয়ম ও সহিংসতা চলে। যার কোনো একটিরও কোনো প্রতিকার হয়নি। সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে প্রতিকার চাওয়ার সাহসও হয়নি। অনিয়ম এবং জীবনহানির অসংখ্য ঘটনা প্রতিকারবিহীনভাবে মিলিয়ে যায়।

---

[1] সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক-এর নির্বাহী সদস্য ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্টবিজ্ঞান ও সমাজতত্ত্ব বিভাগের খণ্ডকালীন অধ্যাপক।

কিন্তু এরমধ্যেও আবার নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুর–এ তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। যদিও এরপর দু দফায় (প্রথম দফায় ২৮ ডিসেম্বর ২০১৭, পৌরসভা, ইউনিয়ন ও জেলা পরিষদের ১২৭টি পদে এবং দ্বিতীয় দফায় ২৯ মার্চ ২০১৮, ১২৭টি–৩৪টিতে সাধারণ পদে ও ৯৩টিতে উপ-নির্বাচন) অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকারের নির্বাচনগুলো ছিল প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে এখন গাজীপুর ও খুলনার নির্বাচন। এখন নাগরিক মনের প্রশ্নগুলো কিছুটা নিম্নরূপ:

১. ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণের স্থগিত নির্বাচনের ভাগ্যে কী ঘটেছে বা ঘটতে যাচ্ছে? এ নির্বাচন কি জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা আছে?
২. পাঁচটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচনী তফসিল একসাথে না হয়ে প্রথমে দুটিতে করার কারণ কী? এ পাঁচটি নির্বাচন কি একই তফসিলে করা যেত না?
৩. রমজানের পর বাকি তিনটি ও ঢাকার দুটি করপোরেশনের স্থগিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা কি নিশ্চিত?
৪. বর্তমান দুই সিটি ও অন্য তিন বা সর্বমোট বাকি পাঁচটি করপোরেশনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানে সরকার ও নির্বাচন কমিশন কী রূপ ভূমিকা পালন করতে পারে?
৫. এ নির্বাচনসমূহে অংশগ্রহণকারী সকল দল ও ব্যক্তির জন্য সমান সুযোগ কি নিশ্চিত করা হবে?

এসব প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তর আজকে গোলটেবিলে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণের জন্য তোলা থাকলো।

'সুজন'-এর মূল বক্তব্য:

'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' সংগঠন হিসেবে এবং আমি নিজে ব্যক্তি হিসেবে আমাদের অবস্থান অত্যন্ত পরিষ্কার। নির্বাচনে দল ও প্রার্থীর জয়-পরাজয় নিয়ে আমরা ভাবিত নই। আমাদের প্রধান চাওয়া সুষ্ঠু ও আইনানুগ নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিশ্চিত হোক। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশন, সরকার অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের প্রশাসনিক অধিকর্তাগণ যার যা দায়িত্ব তারা নিরপেক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে তা পালন করুন, অংশগ্রহণকারী সকল দল ও ব্যক্তিগণ নির্বাচনী সদাচারণ করুন, এলাকার নাগরিকগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আগ্রহী হোক এবং কিছু ত্যাগ স্বীকারে অঙ্গীকারবদ্ধ হোক। নাগরিক সক্রিয়তা ছাড়া গণতন্ত্র অর্থবহ ও বিকশিত হতে পারে না।

নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে সুষ্ঠু, সুন্দর, নিরপেক্ষ এবং সর্বশেষ নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

১. মনোনয়ন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও বাণিজ্যমুক্তকরণ করা এবং দলের স্থানীয় সংগঠনের মতামতকে গণতান্ত্রিকভাবে বিবেচনার যে সুযোগ আইন করে দিয়েছে তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা দরকার। উপর থেকে প্রার্থী চাপানোর প্রবণতা বন্ধ করা হোক।
২. প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি সন্নিবেশন করে নির্বাচনী আইনে যে হলফনামার বিধান রয়েছে তা সঠিক পন্থায় যাচাই-বাছাই নিশ্চিতকরণ। হলফনামায় অসত্য তথ্য প্রদান বা তথ্য গোপন করা হলে প্রার্থিতা বাতিল এবং নির্বাচিত হয়ে গেলে তার নির্বাচন বাতিলের যে আইনি বিধান তা যথাযথভাবে কার্যকরণ। এটি নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনকালীন নিযুক্ত একটি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব দিয়ে এ কাজটি করানো যেতে পারে।
৩. নির্বাচনী ব্যয় পর্যবেক্ষণের (মনিটর) একটি সুষ্ঠু পদ্ধতি চালু করা প্রয়োজন। আইন নির্ধারিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করলে বর্তমানে তা যাচাইয়ের সঠিক ব্যবস্থা মাঠে কার্যকর নেই।
৪. নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচন সমাপ্তির অন্তত এক সপ্তাহ পর্যন্ত নির্বাচন সংক্রান্ত নানা ধরনের অভিযোগ গ্রহণ ও তা প্রতিকারের একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করা উচিত। দল ও প্রার্থীগণ সর্বসময়ে দেখা যায়, আনুষ্ঠানিক বা লিখিত অভিযোগ না করে সংবাদ সম্মেলন করে নানা অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। এভাবে গণমাধ্যমে অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ চলে। গণমাধ্যমে বলতে পারেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সুনির্দিষ্ট একটি অভিযোগ সেল থাকা প্রয়োজন, যারা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিতে পারেন।
৫. সংবাদ মাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বা নানা অনিয়মের যেসব সংবাদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নিয়মিত প্রকাশ করা হয়, নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় তা গ্রহণের বিধান সংযুক্ত করা যেতে পারে। এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতেও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।
৬. নির্বাচনকালীন প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ওপর নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নজরদারি প্রয়োজন। যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে না তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কাছে লিখিতভাবে প্রতিবেদন এবং যারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে তাদের জন্য প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থা থাকা উচিত। যা তাদের নিজ নিজ চাকরির ব্যক্তিগত নথিতে সংরক্ষিত থাকবে এবং ভবিষ্যতে পদোন্নতি বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে।
৭. নাগরিক সক্রিয়তার বিষয়টি পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ নাগরিক সক্রিয়তার কোনো বিকল্প নেই। নাগরিক সক্রিয়তার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।
৮. বর্তমানে নানা কারণে ভোটে অংশগ্রহণে গণউদাসীনতা দেখা দিয়েছে। গণউদাসীনতার কারণগুলো ব্যাপক ও বিস্তৃত। যেমন, একতরফা ও জবরদস্তিমূলক ভোট ছিনতাই সংস্কৃতি, উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব, নির্বাচনের পর নির্বাচিতদের গণবিচ্ছিন্নতা, আইনের

শাসনের অনুপস্থিতি ইত্যাদি। গণউদাসীনতা সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের পথে একটি বড় বাঁধা। জনগণকে সক্রিয়ভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার যতরকম উপায় আছে তা নিতে হবে।

৯. ব্যাপকভাবে জনগণ ভোটকেন্দ্রে এসে ভোটের গণজোয়ার সৃষ্টি করলে প্রশাসন বা যারা সুক্ষ বা স্থুল কারচুপির ফাঁদ পাতে তাদের সে ফাঁদ পাতার কৌশল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়।

১০. অসত্য তথ্য হলফনামায় দেয়া হলে কিংবা তথ্য গোপন করলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ 'কাউন্টার এফিডেভিট' দেয়ার বিষয়ে সক্রিয় হওয়া উচিত। বর্তমানে খুলনার বিএনপি প্রার্থী তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন তা একটি অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ। নির্বাচন কমিশন আশা করি এক্ষেত্রে ন্যায়ানুগ আচরণ করবে।

১১. নির্বাচনে নাগরিকগণ এ হলফনামার তথ্যসমূহকে প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতার একটি মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন।

১২. সৎ, শিক্ষিত এবং অতীত সমাজকর্মের অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে বিচার করে যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ণয় করার দিকে ভোটারদের অধিক মনোযোগী হতে হবে।

অতীতের তথ্য পর্যালোচনা করলে ১১টি সিটি করপোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচিত ৫৩১ জন (মেয়র, সাধারণ কাউন্সিলর ও নারী কাউন্সিলর) জনপ্রতিনিধির হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাদের মধ্যে ৪০% স্কুলের গণ্ডি পার হননি, ১৫% এসএসসি, ২০% এইচএসসি এবং মাত্র ২৩% স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। সিটি করপোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানে কাজ করার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একমাত্র নির্ণায়ক না হলেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা একেবারে গুরুত্বহীন নয়। অধিক শিক্ষিত ব্যক্তির সিটি করপোরেশনে আসা উচিত।

পেশার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ৫৩১ জনের মধ্যে ৩৭৮ জন (৭১%) এর পেশা ব্যবসা। ব্যবসায় যারা সফল তারা নিঃসন্দেহে মেধাবী। কিন্তু সিটি করপোরেশন পরিচালনায় শুধু ব্যবসায়িকজ্ঞানই যথেষ্ট নয়, এখানে অন্যান্য পেশা যেমন, আইন, শিক্ষকতা, সমাজকর্ম এগুলোর আনুপাতিক সমাবেশ প্রয়োজন।

এসবই জনচাহিদার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ীর সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত হয়ে আসা আপত্তিকর নয়। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রার্থী কী ব্যবসা করেন, কীভাবে ব্যবসা করেন তা জানা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ। সিটি করপোরেশনগুলোর কাউন্সিলরদের মধ্যে সন্ত্রাসী, হত্যা মামলার আসামী, মাদক ব্যবসায়ী, তদবিরবাজ, নারী নির্যাতনকারী ও অন্যান্য অপরাধের সাথে জড়িতদের একটি অংশ রয়েই যাচ্ছে। এ বিষয়গুলো জনবিবেচনায় গুরুত্ব পাওয়া উচিত। এ জাতীয় প্রার্থীদের নির্বাচন থেকে দূরে রাখার জন্য একদিকে নির্বাচন কমিশন, অপরদিকে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা থাকা উচিত।

প্রতীকের নির্বাচনে প্রার্থীর যোগ্যতা ও অযোগ্যতাঃ

বর্তমানে দলীয় প্রতীকের যে নির্বাচন তার একটি প্রধানতম সীমাবদ্ধতা হচ্ছে প্রার্থীর যোগ্যতা-অযোগ্যতাকে গৌণ-জ্ঞান করে দল ও দলের প্রতীক প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে। এটি অবশ্য বিশ্বজনীনভাবেই হয়। সাধারণত মানুষ দলের প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় প্রতীকের ব্যবহারে কিছু মৌলিক ত্রুটি রয়ে যাচ্ছে। এখানে কাউন্সিল বা পরিষদ কোনো গুরুত্ব পাচ্ছে না। দলীয়ভাবে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে সাধারণত মেয়র বা চেয়ারম্যানগণই প্রাধান্য বিস্তারিত করে থাকেন। সাধারণত দলীয় প্রতীকের নির্বাচনে কাউন্সিলরের নির্বাচনটাই মূখ্য হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে কাউন্সিলর বা পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচনে এবং পরিষদ পরিচালনায় অবহেলিত থাকেন। সদস্য ও কাউন্সিলরদের নির্বাচন দলীয় প্রতীকে করা হয় না। তাই আমাদের স্থানীয় সরকার নির্বাচন ব্যবস্থাটি আধা-দলীয়, আধা-নির্দলীয়। অপরদিকে দলীয় প্রার্থীর প্রবল প্রতাপে নির্দলীয় প্রার্থীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

স্থানীয় সরকারব্যবস্থা ও স্থানীয় নির্বাচনের সংস্কার ভাবনাঃ

আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে স্থবিরতা চলছে। তাই এ ব্যবস্থার বহুমুখী সংস্কার প্রয়োজন। এসব সংস্কার ভাবনাগুলো আজকাল আর আলোচিত হয় না। শুধু নির্বাচনকালীন নির্বাচনকে ঘিরে যে আলাপ-আলোচনাগুলো হয় তাতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর, গতিশীল, সেবামুখী, জবাবদিহিমূলক ও দক্ষতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের বিষয়টি বরাবরই অবহেলিত থাকে।

আজকে যে বইটির মোড়ক হলো (নগরায়ন ও নগর সরকার), সেটি তেমনি একটি পুস্তক, যাতে একদিকে আমাদের নগরের নির্বাচনকে যেমন বিশ্লেষণ করা হয়েছে, তেমনি এতে রয়েছে কিছু সংস্কার প্রস্তাব। এছাড়াও দুই বছর পূর্বে এ বিষয়ে আরও কিছু সুনির্দিষ্ট (নয়টি) প্রস্তাব একটি ভিন্ন পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় (Bangladesh: Reform Agenda for Local Governance, 2016, BGID, BRAC University, প্রথমা)। এখানে মোদ্দকথায় যা বলা হচ্ছে,

১. স্থানীয় সরকারব্যবস্থায় নগর ও গ্রামের মধ্যকার বিভক্তি এবং এত অধিক সংখ্যক উপর-নিচ স্তর বর্তমান সমাজ বাস্তবতায় কতটুকু বাস্তবসম্মত। একদিকে পল্লী ও নগরের বিভক্তি-বিভাজন পুনর্বিবেচনা এবং স্তর সংখ্যা হ্রাস করার বিষয়টি মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

২. দেশে কেন্দ্রে যে সরকারব্যবস্থা তা 'সংসদীয়' পদ্ধতির, কিন্তু আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থা 'রাষ্ট্রপতি' শাসিত সরকারের আদলে পরিচালিত। এ ব্যবস্থার সংস্কার করে তৃণমূলে সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকারব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। তা না হলে নারী ও পুরুষ উভয় ক্যাটাগরির কাউন্সিলর ও সদস্যগণের নির্বাচন অর্থহীন হয়ে পড়ছে।

৩. আমাদের প্রতিটি স্তরের স্থানীয় সরকার ভিন্ন ভিন্ন সাংগঠনিক ও ভিন্ন ভিন্ন আইন দ্বারা পরিচালিত। এখানে একটি অভিন্ন আইন কাঠামো এবং একীভূত সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন। এজন্য প্রয়োজন Local Goverment Framework Law (LGFL)। তা হলে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

৪. একটি সরকারের পুরো মেয়াদকাল জুড়ে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে পাঁচ বছর ধরে স্থানীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান ব্যয়বহুল এবং জাতীয়ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্ম দেয়। যদি একীভূত সরকার কাঠামো সৃষ্টি করা হয়, স্থানীয় সরকার আইন-কাঠামো করা হয় এবং সংসদীয় পদ্ধতির স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা হয়, তাহলে নির্বাচন সহজ ও ব্যয় সাশ্রয়ী করা সম্ভব এবং একটি একক তফসিলে ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। সবাই একইসাথে পাঁচ বছরের জন্য কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হবে এবং আন্তঃপ্রতিষ্ঠান উন্নয়ন ও সেবা সমন্বয় সম্ভব হবে।

৫. একীভূত একটি সাংগঠনিক কাঠামোতে স্থানীয় সরকারসমূহ গঠিত হলে স্থানীয় সরকারের জনবল সমস্যার সমাধানে 'স্থানীয় সরকার সার্ভিস' নামক পৃথক একটি ক্যাডার তৈরি করে আন্তঃপ্রতিষ্ঠান বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি সম্ভব হবে।

উপসংহারঃ

২০১৮ নির্বাচনের বছর। ইতিমধ্যে অনেকগুলো নির্বাচন বর্তমান সরকারের অধীনে হয়েছে। ২০১৪ সালের জাতীয় নির্বাচন-সহ এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল স্থানীয় নির্বাচনের মধ্যে শুধুমাত্র নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রংপুরের সিটি নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। বাকি নির্বাচনগুলো বরাবরই ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এখন জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ঢাকা, ময়মনসিংহ-সহ আটটি (গাজীপুর, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল) সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর বর্তাবে। এ নির্বাচনগুলো কতটুকু স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও অবাধে অনুষ্ঠিত হয় তার উপর জাতীয় নির্বাচনের পরিবেশ অনেকখানি নির্ভর করবে।

নিবন্ধটি ২৩ এপ্রিল ২০১৮, জাতীয় প্রেসক্লাবে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক' আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপনের জন্য প্রস্তুতকৃত।